আলো পাঠ
এমএলই নিউজলেটার
অষ্টম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৫

আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ক তৃতীয় কর্মশালা

"মাতৃভাষায় শিক্ষা সকল মানুষের অধিকার"- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এমএলই ফোরামের সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর আয়োজনে আদিবাসী শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের তৃতীয় কর্মশালা গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫-৯ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দিনের এই কর্মশালায় গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও সাদ্রি ভাষার ৩১ জন লেখক ছাড়াও এনসিটিবি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মেছবাহ উল আলম, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মিয়া মোঃ ইনামূল হক সিদ্দীকি, সদস্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ড. আব্দুল মান্নান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ২০১৬ সালে পাঁচটি ভাষার আদিবাসী শিশুদের তাদের স্ব স্ব ভাষার বই হাতে তুলে দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তপন কুমার দাশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. মিয়া মোঃ ইনামূল হক সিদ্দীকি দেরিতে হলেও দেশের অন্য ভাষাভাষী শিশুদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি ও আদিবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতার প্রশংসা করে এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলকে নিয়ে ভালো কাজ করতে চাই। প্রধান অতিথি জনাব মেছবাহ উল আলম আদিবাসী লেখকদের দায়িত্ব ও আন্তরিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, আপনারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করছেন। সভাপ্রধান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল কর্মশালায় আন্তরিকতাপূর্ণ কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপকরণ উন্নয়ন কাজের যে কোনো বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মশালার ৫ম ও শেষ দিনে ৫ দিনের কাজের মূল্যায়ন ও পরবর্তীকালে করণীয় বিষয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, বেসরকারি বিষেশজ্ঞ ও অংশগ্রহণকারী আদিবাসী লেখকগণ মতবিনিময় করেন। ৫টি ভাষার লেখকদের মধ্য থেকে একজন করে প্রতিনিধি, বেসরকারি বিষেশজ্ঞ, এনসিটিবি এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

বাঁধন আরেং

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ ও ইউনেস্কোর ৭০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism: Scope to Make IMLI as a Research Hub শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকারের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ফিলিস ডেইলি, নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুইস্টিকস-এর অধ্যাপক ড. দন রাজ রেগমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নায়রা খান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর সাবেক প্রতিনিধি জার্মানির উল্‌ফ ভোলম্যান, পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাদেকা হালিম, বিশিষ্ট গবেষক ও নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. সফিকুল ইসলাম। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, ঢাকার বিভিন্ন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার তাঁর প্রবন্ধে বলেন, সকল মাতৃভাষা মানব সভ্যতার মূল্যবান সম্পদ এবং এই সম্পদকে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ করতে হবে। সংখ্যালঘু অনেক ভাষার কোনো লিপি নেই, শুধু মৌখিক রূপ নিয়ে টিকে আছে। এটি বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক চিত্রের তীব্র অসমতা নির্দেশ করে। ভাষা পরিকল্পনাকারীদের প্রথমে এই অসমতাকে দূর করতে হবে। ভাষার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার প্রশাসনিক মর্যাদা দান, ভাষার লোকসাহিত্য, গান, গল্প প্রভৃতি অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার ও সংরক্ষণ, মূলধারার ভাষিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা, ভাষার বিভিন্ন উপাদান যেমন : ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডার, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির কাঠামোগত রূপদানে ভাষাবিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে, ভাষা পরিকল্পনাকারীদের গবেষণার কেন্দ্রভূমি হিসেবে কাজ করবে।

অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে বলেন, যে কোনো ভাষার বিভিন্ন ধরনের উপভাষা রয়েছে। সামাজিকভাবে উঁচু স্তরের ভাষাকে প্রমিত উপভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার অ-প্রমিত উপভাষা হিসেবে ব্যবহারকারীদের এটা মনে রাখতে হবে যে, তারা উপভাষায় কথা বলছে কিন্তু ভাষার সামাজিক মানদণ্ডে কেন্দ্র বা মূলধারার ভাষা হতে তাদের ভাষা ভিন্ন নয়। কোনো একটি ভাষাকে প্রমিত হিসেবে রূপ দিয়ে ভাষার কেন্দ্র-প্রান্তের বিভাজন সৃষ্টি করা অনর্থক।

নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরা তাঁর Conceptualizing Multilingualism in Bangladesh : An Interdisciplinary Perspective শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, বহুভাষিকতার ধরন ও মাত্রা, শ্রেণি, এথনিসিটি, লিঙ্গ, ধর্ম, অঞ্চল, বংশ-পরম্পরা প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভাষা বৈচিত্র্যকে পূর্ণ পরিসরে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং বহুভাষিকতার বিভিন্ন ধরন সমাজ- ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডল যেমন : একাডেমিক, নীতি নির্ধারণী পর্যায় ও উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে বহুভাষিকতার ধরন ও মাত্রার উপর ব্যাপক অধ্যয়ন ও সমীক্ষা পরিচালনা, আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ প্রদান করতে হবে, যেখানে একটি সুস্পষ্ট ভাষানীতি ভবিষ্যৎ কার্য সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারে।

পুলক চাকমা

কারিতাস বাংলাদেশ-এর এমএলই কার্যক্রম

কারিতাস ১৯৬৭ সাল থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা রূপে এবং ১৯৭১-পরবর্তী সময়ে জাতীয় পর্যায়ের একটি অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কারিতাস বাংলাদেশ বিশ্বাস করে প্রতিটি শিশুরই মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার এবং নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অনুসরণ ও রক্ষার অধিকার রয়েছে। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পাশাপাশি আদিবাসী শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কারিতাস বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে ফিডার স্কুল কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২০০২ সাল থেকে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের (ICDP) অধীনে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা (এমএলই) কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সাল থেকে এই কাজের তৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পায়। এ সময় মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আলোঘর প্রকল্পের মাধ্যমে বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, শেরপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুরের সর্বমোট ২৫,০০০ জন অনগ্রসর আদিবাসী শিশুর মধ্যে চাকমা, মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, খাসীয়া, গারো, সাঁওতাল এবং ওঁরাও ভাষায় সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী লেখক এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উল্লিখিত উপকরণ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকা (মহিলা ২২১ জন ও পুরুষ ১৭৯ জন) ৪০০টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করছেন। এসকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুরা বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

এমএলই কার্যক্রমের সফলতার জন্য প্রত্যেক ভাষাভাষী শিক্ষকের জন্য আলাদাভাবে তিন দিনের মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং দুই দিনের রিফ্রেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও দ্বি-মাসিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে এমএলই-এর উপর চাহিদাভিত্তিক আলোচনা ও শিখন সহযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। ফলে চাকমা, মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, খাসীয়া, গারো, সাঁওতাল এবং ওঁরাও শিশুরা এখন প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আরও উৎসাহী এবং অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ঝরে পড়ার হার ১ শতাংশের নিচে, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি ৮৫ শতাংশের উপর, বার্ষিক পরীক্ষায় গড় পাশের হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। ফলে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে তারা দৃঢ় পদক্ষেপে সম্পৃক্ত হতে শুরু করেছে। এসব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে।

কারিতাস বাংলাদেশ এরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা কেবল শিক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক এমএলই কার্যক্রম আদিবাসী ভাষা ও ঐতিহ্য চর্চায় যথেষ্ট নয় বরং এই ভাষাগুলোকে সংরক্ষণের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক এমএলই কার্যক্রম জরুরি। সেজন্য ভবিষ্যতে কমিউনিটিভিত্তিক এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে সংস্থা পর্যায়ে বিশেষ পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এ ব্যাপারে সিরিজ আলোচনা, ওয়ার্কশপ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় মানসম্মত প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কারিতাস বাংলাদেশ আরও উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

শিশির এঞ্জেলো রোজারিও

আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক
লেখকদের

সরকারি উদ্যোগে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শি
সাক্ষাৎকার *পহর* পত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রমের পাশ
লেখক মথুরা ত্রিপুরা এবং গারো ভাষার লেখক

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

পহর: সরকারি উদ্যোগে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। আপনার ভাষায় আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের আমন্ত্রণ পেয়ে কেমন লাগছে?

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছিল। সরকার যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই অধিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং উৎসাহিত।

পহর: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের লেখক হিসেবে আপনি কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: আমি আমার মাতৃভাষা ককবরকে দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করে আসছি এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও আমার সংগঠন জাবারাং কল্যাণ সমিতি বিগত প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় ধরে ত্রিপুরাদের ভাষা ককবরক ছাড়াও চাকমা ও মারমা ভাষায়ও অনুরূপ কাজ করে আসছে। সুতরাং প্রস্তুতির দিক থেকে আমরা বলতে পারি, আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচলনের জন্য আমরা পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত রয়েছি।

পহর: আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ফলে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে?

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: পার্বত্য চট্টগ্রাম তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় এই জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মধ্যে প্রবল বাংলা-ভীতি রয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হলে এসব শিশুদের গুণগত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি অকালে স্কুল ত্যাগের পরিমাণ হ্রাস করবে, যা প্রত্যক্ষভাবে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের মতো অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সমস্যা নিরসনেও সন্দেহাতীতভাবে ভূমিকা রাখবে।

পহর: এনসিটিবি'র এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সরকারের

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: এনসিটিবি'র এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য করণীয় কর্মতালিকা উল্লেখ করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তবুও আশু করণীয় হিসেবে উল্লেখ করতে পারি- ১) যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ২) পার্বত্য জেলাগুলোর পিটিআইগুলোতে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা, ৩) সমতলের আদিবাসী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয়ভাবে (এনসিটিবি বা যে কোনো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধীনে হতে পারে) একটি সেল গঠন করা, ৪) পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা, ৫) নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলো মূল্যায়ন ও সংশোধনীর ব্যবস্থা করা।

পহর: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে স্থানীয়ভাবে (জাতিগোষ্ঠী হিসেবে) কী করা যায়।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা পরিষদ নিজস্ব বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমেই যেসব স্কুলে পর্যাপ্ত আদিবাসী শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে। ভাষা বিশেষজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিকদের প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর উপর গঠনমূলক সমালোচনা, পরামর্শ ইত্যাদি অব্যাহতভাবে দিতে পারেন। সামাজিক সংগঠনগুলো নিজ নিজ ভাষায় লেখ্যরূপ, বানানরীতি, প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অব্যাহতভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, আলোচনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে পারে।

পহর: প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বই পড়ানো যাবে কী? না হলে কী করতে হবে?

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব শিখন-শেখানো সামগ্রী স্কুলগুলোতে প্রচলন করা যাবে। তবে তার জন্য ন্যূনতম ৩ থেকে ৫ দিনের একটি অবহিতকরণ কর্মশালার প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা তো বটেই, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন পঠন-পাঠন কৌশল।

পহর: বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন?

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: ত্রিপুরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটু আন্তরিক ও উৎসাহী হলে প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করে তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন উদ্যোগ
সাক্ষাৎকার

ক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। যে সকল আদিবাসী লেখক এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, তাঁদের পশি প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যাবে। এ সংখ্যায় ত্রিপুরা ভাষার (ককবরক) বাঁধন আরেং-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো।

বাঁধন আরেং

পহর: সরকারি উদ্যোগে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। আপনার ভাষায় আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের আমন্ত্রণ পেয়ে আপনার কেমন লাগছে?

বাঁধন আরেং: প্রথমবারের মতো সরকারি উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আমার জাতিগোষ্ঠী গারো আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হচ্ছে। এ উপকরণ প্রণয়ন দলের একজন সদস্য হতে পেরে আমি আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। গারো শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে।

পহর: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণের লেখক হিসেবে আপনি কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?

বাঁধন আরেং: আমার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কালচারাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিডিএস)-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে শেরপুর জেলায় গত ১৬ বছর ধরে আমি কাজ করেছি। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক গারো শিশুদের জন্য দুটি পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছি। ২০১০ সাল থেকে নিজস্ব উদ্যোগে আমরা দুটি স্কুলে জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি মাতৃভাষায় শিশুদের পাঠদান শুরু করেছি। সব মিলিয়ে আমরা একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়াস চালিয়েছি।

পহর: আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ফলে আপনার জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে?

বাঁধন আরেং: বর্তমানে নানা কারণে গারোদের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক সংকট অনেক বেশি। বাস্তবতা হলো শহর বা এর আশেপাশের গারো শিশুরা নিজের ভাষায় ভাব প্রকাশ বা কথা বলতে পারে না। যে কারণে শিশু ও নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে পারে না। এমন বাস্তবতায় মাতৃভাষায় প্রণীত শিক্ষা উপকরণ মাঠ পর্যায়ে পৌছালে সকল শ্রেণির গারোদের মাঝে নতুন করে আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি হতে শুরু করবে। নিজস্ব ভাষার বই পেয়ে শিশুরা খুশি হবে।

পহর: এনসিটিবি'র এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে আর কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে?

বাঁধন আরেং: এনসিটিবি'র এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করি (১) সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (২) আদিবাসী অধ্যুষিত সমতল ও পার্বত্য জেলাগুলোর যেসব এলাকায় পিটিআই রয়েছে সেসব পিটিআইগুলোতে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা (৩) সমতলের আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত পৃথক একটি সেল গঠন করা (৪) জাতীয় বাজেটে শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলো মূল্যায়ন ও সংশোধনীর ব্যবস্থা রাখা।

পহর: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে স্থানীয়ভাবে (জাতিগোষ্ঠী হিসেবে) কী করা যায়?

বাঁধন আরেং: মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি সেসব সফল করার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব।

পহর: প্রশিক্ষণ ছাড়া এসব বই পড়ানো যাবে কী? না হলে কী করতে হবে?

বাঁধন আরেং: শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবশ্যই প্রয়োজন হবে। প্রশিক্ষণ ছাড়াও এসব শিখন-শেখানো সামগ্রী স্কুলগুলোতে হয়ত পড়ানো যাবে। তবে এর জন্য ন্যূনতম ৫-৭ দিনের একটি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন।

পহর: বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত স্কুলে শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন?

বাঁধন আরেং: গারো শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পড়াতে পারবেন। তবে কার্যকর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

চাকমা জাতিসত্তার বিঝু উৎসব

চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনদিনব্যাপী বিঝু উৎসব উদযাপন করে। প্রতি বছর এ সময়ে একটি পাখি 'বিঝু...বিঝু' ধ্বনি তুলে আদিবাসী পাহাড়ি জনপদে বিঝু উৎসবের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে। এই তিনদিন চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল প্রাণী হত্যা করে না। এ সময় ঘরে ঘরে নানান পদের সুস্বাদু খাদ্য রান্না হয়। বিঝু উৎসবে তারা ছুটি ভোগ করে।

বিঝু উৎসবের প্রথম দিন ৩০ চৈত্র পালিত হয় ফুলবিঝু। চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুল বিঝু পালন করে। এদিন ভোরে তারা নদী অথবা ঝর্ণায় স্নান করতে যায়। তারপর বনফুল এবং পাতা দিয়ে জুমঘর, কেয়াংঘর (চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল বৌদ্ধ মন্দিরকে বলে কেয়াং) বাসস্থান সাজায়। বাড়িঘর, আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পবিত্র পানি ছিটিয়ে শুদ্ধ করে। ভগবান বুদ্ধের মূর্তি সমবেতভাবে নদীর ঘাটে এনে স্নান করিয়ে আবার যথাস্থানে বসিয়ে বন্দনা করে। পঞ্চশীল গ্রহণ করে। জলদেবীকে শান্ত করতে নদীর ঘাটে কেউ কেউ পূজা করে। চাকমা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, এমনকি নব দম্পতিরা নদী থেকে পানি এনে প্রবীণ স্বজনদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। রাতে প্রদীপ পূজা করে। এ সময় সমগ্র চাকমা জনপদ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফুলবিঝুর দিন চাকমা ছেলেমেয়েরা একে অন্যের গৃহপালিত পশু-পাখিকে খাদ্যশস্য খাওয়ানোর মাধ্যমে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে।

মূল বিঝু উদযাপিত হয় ৩১ চৈত্র। চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল এদিনকে বিঝু উৎসবের প্রধান দিবস হিসেবে বিবেচনা করে। এদিন প্রতি ঘরে থাকে নানান পদের খাদ্যসম্ভার। কমপক্ষে পাঁচ রকমের তরকারি ছাড়াও নাড়ু, বিনি ভাত, মিষ্টান্ন এবং বিশেষ ধরনের পাচন প্রায় সকল চাকমা পরিবারে থাকে। সকাল থেকেই এই খাওয়ার ধুম লেগে যায়। একে অন্যের বাড়িতে এই ভুরিভোজে অংশগ্রহণ করে। এদিন কেউ কাউকে দাওয়াত করতে হয় না। তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে খাওয়া-দাওয়া এবং হৈ-হুল্লোড় করে পুরাতন বছরকে বিদায় জানায়।

নতুন বছরের প্রথম দিনকে চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল বলে গচ্ছে গচ্ছে দিন। চাকমা ভাষায় গচ্ছে গচ্ছে শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গড়াগড়ি। গত দু'দিনের অতিরিক্ত ভুরিভোজের পর এদিনটি বিশ্রামের দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্রামের সময় সমমনারা নানান খোশগল্পে মেতে ওঠে। এদিন সাধারণত প্রবীণ স্বজনদের যত্ন করে খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে। এছাড়া তারা বুদ্ধমূর্তির সামনে প্রার্থনা করে। এভাবে তারা নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

বিঝু উপলক্ষে নৃত্য-গীতের আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রদীপ নৃত্য এবং তালপাতার পাখা নৃত্য। এর সঙ্গে চাকমা বাঁশি শিমুর এবং আদিবাসী ঢোল বাজানো হয়। এসময় নৃত্যশিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী চাকমা পোশাক পরে।

কুমার প্রীতীশ বল

হাজং ভাষা

লেওয়াটানা নাচ গাহেন

লেওয়াটানা নাচ গাহেন বহু আগেলা পুরুষ থকন হাজং সমাজনি চুলিয়ী আহিছে। ইদী হাজংগিলীলী জনপ্রিয় গাহেন। উদীলী এগরা ইতিহাস আছে। খাটিয়ী খাওয়া হাজংগিলী আগে জঙ্গল ও লেওয়া কাটিয়ী খিতিবারি কুরিবীন। হাজং চিংরা চিংরি হুবাই মিল্লী ই জঙ্গল ও লেওয়া কাটিবীন। চিংরা চিংরি ই কামরা কুরিবাভুলা উরা তকমক বারানি আহে। তানি উমলা মননি ভালাপাবালা বীজ জনম নেয়। লেওয়া কাটিয়ী ভুই বানায় আর গাহেন গায়। উদিই ই গানডাগে লেওয়াটানা গাহেন কয়। লেওয়া টানিয়ী হাজং চিংরালী গাওদিয়ী ঘীম পড়ে। ইদী দিখী চিংরিলী মননি মায়া জুনমায়। পাছে অয় চিংরাগে সাহায্য কুরবাগে আগবারিয়ী আহে। চিংরালা কষ্ট হালকা হয়, অয় চিংরি থকন মননি শুক্তি পায়। উদীই চিংরা আদরকুরিয়ী গাহিয়ী উঠি ...

আয় বুইনি সকলে লেওয়াটানা রং এ

লেওয়া টানিয়ী যাং নিজ ঘরে।

চিংরিলী কয়...

লেওয়ারা টানিলে মাইধীতে ছিরিলে

দাদা মুগে জোড়া লাগ্‌গিয়ী দি।

আবার চিংরিগে ভালা পীইয়ী চিংরারা কয়...

টকলে বারি ঘোপাতে, টকলে ফল পাকিছে

আয় বুইনি টকলে খাবা যাং।

চিংরালা গাহেন হুনিয়া চিংরিলী মনপ্রাণ নীচিয়ী উঠি। চিংরালা বারানি যাবাগে মন ইচপিচ করে। কিন্তু ভান ধুরিয়ী গাহেন গাওয়ায় ...

টকলে বারি না যায় ময়, টকলে ফল না খায় ময়

টকলে খালে মুখ কালা হয়।

আবার দিঘি কুলা জালাভুইনি গুরু লাগিছে। চিংরি গুরুগে আনবা যালে চিংরাগে দিখিবাগে পায়। চিংরা জালা তুলিবা যাছে। দিঘি কুলা তাল গাছনি মীও বাহা দিখী চিংরি চিংরাগে কয়...

লিংলিঙী গাছনি মীও বাহা লাগিছে

দাদা মুগে পারি দি ময় খাং।

দিঘলী তাল গাছনি উঠিবা সুবিধা নীই দিখী চিংরা অয় গাওয়ায়...

ধুরিবাগে ডালা নীই, উঠিবাকো লেওয়া নীই

লেওয়া ছাড়া পারিবীগে না পায়।

ইংকীই খাটিয়ী খাওয়া হাজং জনজীবননি লেওয়াটানা গাহেন সৃষ্টি হুছে।

স্বপন হাজং

বাংলা ভাষা

লেওয়াটানা নাচ গান

লেওয়াটানা নাচ-গান বহু দিন ধরে হাজং সমাজে চলে এসেছে। এটাই হাজংদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এর একটা ইতিহাস আছে। খেটে খাওয়া হাজংরা আগে জঙ্গল ও ঝোপঝাড় কেটে বসতবাড়ি তৈরি করত। হাজং ছেলে-মেয়ে মিলে এ কাজ করত। তখন তাদের মাঝে ভালোলাগা তৈরি হতো। লতা কেটে জমি বানাত আর গান গাইত। সে কারণে এ গানকে লেওয়াটানা (লতাটানা) গান বলা হয়। লতা টানতে গিয়ে হাজং ছেলের গা দিয়ে ঘাম ঝরত। এটা দেখে মেয়েটির মনে মায়া জন্মাত। তখন সে ছেলেটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। এতে ছেলেটির কষ্ট লাঘব হতো। তাই ছেলেটি আনন্দে গেয়ে ওঠে,

এসো বোন সকলে লতাটানের রঙ্গে

লতা টেনে যাই নিজ ঘরে।

মেয়েটি বলে,

লতাখানি টানিলে মধ্যিখানে ছিঁড়িলে

দাদা আমায় জোড়া দিয়ে যাও।

আবার মেয়েটিকে ভালো লাগলে ছেলেটি গায়,

টকলে বাগানের ঝোপেতে

টকলে ফল পেকেছে

এসো টকলে খেতে যাই।

ছেলেটির গান শুনে মেয়েটির মনপ্রাণ নেচে উঠে। ছেলেটির কাছে যেতে মন তার আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু ভান করে গান ধরে,

টকলে বাগানে যাব না, টকলে ফল খাব না

টকলে খেলে মুখ কালা হয়।

আবার দিঘির পাড়ে জালাক্ষেতে গরু লেগেছে দেখে মেয়েটি গরু আনতে যায়। তারপর ছেলেটিকে দেখতে পায়, ছেলেটি জালা তুলছে। দিঘির পাড়ের তালগাছে মৌচাক দেখে মেয়েটি ছেলেটিকে বলে,

লম্বা উঁচু গাছেতে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে

দাদা আমায় পেড়ে দাও আমি খাই।

দিঘির পাড়ের তালগাছটিতে ওঠার সুবিধা নেই দেখে ছেলেটি গায়,

ধরিবার ডাল নেই উঠিবার লতা নেই

লতা ছাড়া ওঠা সম্ভব নয়।

এভাবেই খেটে খাওয়া হাজং জীবনে লেওয়াটানা গানের সৃষ্টি হয়েছে।

হাজং হরিদাস রায়

আদিবাসী শিশুদের জন্য ৫টি ভাষায় শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন

শিল্পী কনকচাঁপা চাকমার সাক্ষাৎকার

পহর : সরকার ৫টি ভাষায় আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। একজন সচেতন আদিবাসী হিসেবে আপনার অনুভূতি কী?

কনকচাঁপা : সরকারের এই উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। আদিবাসীদের এটা বহুদিনের আশা এবং স্বপ্ন। এজন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই।

পহর : পরিকল্পিত শিক্ষা উপকরণে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি কতটুকু প্রতিফলিত হবে বলে মনে করেন?

কনকচাঁপা : আমি আশাবাদী, একটি পরিকল্পিত শিক্ষা আদিবাসীদের জীবনকে বদলে দিতে পারে। এভাবে যদি সরকার তার ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে তাহলে আদিবাসীদের জীবন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে।

পহর : নতুনভাবে প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহ কতটুকু সমর্থ হবে বলে মনে করেন? এ জন্য বিদ্যালয়ে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?

কনকচাঁপা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি একটু যত্নশীল হওয়া যায়, তাহলে এই নতুনভাবে প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক উপকরণ ব্যবহারে সফলতা আসবে। প্রথমে ভাবতে হবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যথাযথভাবে তৈরি করা। বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাটা যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষকদের একটি গাইডলাইন দেওয়া, তারা কীভাবে শিক্ষাদান করবেন। বিদ্যালয়গুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের অভাব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেউ যেতে চান না। এজন্য সেখানে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পহর: কয়েকটি আদিবাসী গ্রুপ মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে, একই সময়ে অন্যান্য ভাষাভাষী শিশুরা কী বাংলা পড়বে, না কি অন্য ভাষায় পড়বে? এ ব্যবস্থাটি আবার কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করবে কিনা?

কনকচাঁপা: কয়েকটি আদিবাসী গ্রুপ দিয়ে এই শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও যত আদিবাসী রয়েছে তাদের ভাষায়ও লেখাপড়ার সুযোগ ঘটবে। শুরুর যাত্রাটাই কঠিন। আস্তে আস্তে এগুলোও এই কার্যক্রমের আওতায় চলে আসবে। আমার মনে হয় না, এখানে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি হবে। বরঞ্চ শুরু হয়েছে বলে এখানে আশা রাখা যায়।

পহর: শতভাগ আদিবাসী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কী?

কনকচাঁপা: আদিবাসী শিশুদের অঞ্চলভেদে অনিয়মিত ছাত্রছাত্রী দেখা যায়। এর পাশাপাশি অনাগ্রহী শিশু তো রয়েছেই। কোনো কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে নদী এবং লেকের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে নৌকা ছাড়া স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতিটি পরিবার ঐ জলযানের যোগান দিতে পারে না। কোনো কোনো অঞ্চলে খরা মৌসুমে ভয়াবহ গরমও আরো একটি অন্তরায়। যদি পরিকল্পনামাফিক শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যায়, তবে ৭০ ভাগ সমস্যা দূর হবে। অবশিষ্ট ৩০ ভাগ হলো হতদরিদ্র অভিভাবকদের মনমানসিকতা। ঐ সকল অভিভাবক নিজেরাই কতটুকু বুঝেন শিক্ষার গুরুত্ব, সেটাও প্রশ্ন হয়ে আমার সামনে উঠে আসে। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার আলো একটি জীবনে কতটা জরুরি এবং এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিভাবকদের জন্য কর্মশালার প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মশালা কেবল আদিবাসীদের জন্য নয়, পুরো বাংলাদেশেই হওয়া প্রয়োজন। তখন প্রতিটি মাতা-পিতা বুঝতে পারবে, শিক্ষাই তাদের মেরুদণ্ড।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান**-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক

৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭

ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১

ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

European Union